OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 854 - 871
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে লালবিহারী দে : তাঁর অনালোচিত কয়েকটি ইংরেজি প্রবন্ধে বাঙালির ধর্মবিশ্বাস-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের পরিচয়

রামপ্রসাদ বেরা
গবেষক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rambera216@gmail.com
0009-0002-6381-5875

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Reverend Lal Behari Dey, Lal Behari Dey as Journalist, Lal Behari Dey's English Writings, Lal Behari Dey as Essayist, Lal Behari Dey on Religious Thought, Lal Behari Dey on Bengali Socio-Cultural Life.

Abstract
The nineteenth century was one of the most dynamic and illustrious periods in the history of India, and particularly of Bengal. In every sphere—be it society, culture, education, religion, or commerce—the prevailing status quo was shattered, giving rise to a powerful surge of change. Consequently, new avenues and directions emerged within the sphere of Indian public action. A primary objective of this movement was to engage with and assimilate Western knowledge. As a result, the nineteenth century witnessed the rise of numerous luminaries who made profound contributions to the socio-cultural fabric of both Bengal and India. Among this multitude of figures, several Bengalis have transcended the boundaries of their own era; even two centuries later, they continue to—and will forever—resurface in our intellectual discourse and cultural consciousness. Prominent among these social reformers, educationists, thinkers, and litterateurs are Raja Ram Mohan Roy (1772–1833), Ishwar Chandra Vidyasagar (1820–1891), Akshay Kumar Datta (1820–1886), Michael Madhusudan Dutt (1824–1873), and, of course, Reverend Lal Behari Dey (1824–1894). Lal Behari Dey was born in the village of Sonpalashi in the district of Bardhaman. His father was employed in Kolkata. Upon completing his elementary education at the village pathshala (traditional school), he was enrolled in a school in Kolkata. A gifted student, Lal Behari pursued his higher education under extremely arduous circumstances. Following his father's untimely death during his youth, he was compelled to chart his own path in life. Drawn to Christianity, he renounced his Hindu faith and subsequently embarked on a career as a Christian evangelist. Lal Behari vehemently protested against the discriminatory practices wherein indigenous clergy—despite possessing qualifications equal to those of their foreign counterparts—were treated with condescension or denied equal opportunities. Yet, amidst all these endeavors, his life was also marked by a succession of tragic events. The most heart-wrenching of these was the loss of his children. Nevertheless, despite the various vicissitudes that subsequently befell him, Lal Behari remained steadfastly devoted to his work and continued to pursue his literary vocation with unwavering dedication.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reverend Lal Behari Dey was, first and foremost, a religious evangelist; yet, he simultaneously excelled in diverse roles—as a writer, journalist, editor, and public orator. He contributed essays to various periodicals, such as 'The Calcutta Review' and 'The Hindu Patriot', and served as the editor of the journal 'Arunoday'. We shall examine the essence and subject matter of several of his lesser-discussed English essays, through which he sought to illuminate diverse facets of Bengali life—including religious beliefs, socio-cultural norms, festivals, and rituals. In his writings, we encounter not only a vivid portrayal of the society and era in which he lived but also the intellectual currents and ideas prevalent during that time. The world-renowned scientist Charles Darwin was so captivated by the thematic depth and lucidity of Lal Behari Dey's writing that he offered him high praise. Even two centuries later, the relevance of the writings of this illustrious son of Bengal remains undeniable.

Discussion

পর্ব - ১

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল একটি অন্যতম কর্মময় উজ্জ্বলতম শতাব্দী। সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-ধর্ম-ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে স্রোতের সঞ্চার ঘটেছিল। তার ফলেই, ভারতীয়দের কর্মপন্থায় নতুন নতুন দিকের উন্মোচন হয়। এই কর্মপন্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখি বহু মনীষীদের। যাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। সেই অগণিত মানুষের মধ্যে সমকালকে অতিক্রম করে দুই শতাব্দী পরেও বেশ কিছু বাঙালি—মননে এবং চর্চায় তাঁরা ফিরে ফিরে আসেন এবং আসবেন। সেই সমস্ত সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজন হলেন— রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এবং অবশ্যই রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪)।

লালবিহারী দে বর্ধমানের সোনপলাশি গ্রামের দে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার নবাবের থেকে মণ্ডল উপাধি পেয়েছিল। পিতা ছিলেন রাধাকান্ত দে মণ্ডল। লালবিহারীর পিতা কলকাতায় কোম্পানির কাগজ আর হুন্ডির দালালি করতেন। কোনরকমে কোম্পানির কাজ চালানোর মতো দু-একটা ইংরেজি শব্দ জানতেন। কিন্তু রাধাকান্ত এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষত তিনি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে— কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য; বা অন্যান্য কাজকর্মের জন্য ইংরেজি জানা এবং শেখাটা খুব প্রয়োজন। ফলে তিনি ছেলেকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করেন। সেখান থেকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করে দেন। লালবিহারী দে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় সর্বদাই ভালো ফল করতেন। 'কলিকাতা-দর্পণ' (দ্বিতীয় পর্ব) গ্রন্থে রাধারমন মিত্র আমাদের জানিয়েছেন—

> "ছ-বছর বয়সে হাতেখড়ি দিয়ে লালবিহারীকে পিতা এই পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। সেখানে ভূঁই-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর, তালপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে দুই বছর, কলাপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর চার বছর পড়ে যখন তিনি কাগজ-পড়ুয়ার শ্রেণীতে উঠলেন, তখন পিতা তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ১৮৩৪ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে, দেন। স্কুল বিভাগে তখন মোট দশ বছর পড়তে হত। লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সাত বছরের মধ্যে সকল পরীক্ষার সর্ববিষয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, মাত্র একবার ছাড়া।"[১]

পিতাই লালবিহারীর একমাত্র অবলম্বন ছিল কলকাতায়। পিতার উপার্জনেই কোনক্রমে পিতা পুত্রের দিন গুজরান হত। এমন পরিস্থিতি ছিল যে, ক্লাসের সব বইও লালবিহারীকে তিনি কিনে দিতে পারতেন না। কমদামের কয়েকটি বই কিনে দিতে পারতেন। আর লাল বিহারী নিজের চেষ্টায় এবং আগ্রহে সহপাঠীদের কাছ থেকে দামি বইগুলি চেয়ে নিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পড়তেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়বার সময় লালবিহারীর পিতা মারা যান। তখন তাঁর বয়স বারো-তেরো। পিতৃহারা পুত্র, বাবার এক পিসতুতো ভাইয়ের কাছে আশ্রয় পেলেন। সেখানকার কাজের লোক কুঞ্জর মা লালবিহারীকে খুব সাহায্য করেছিলেন তাঁর পড়াশোনার জন্য। থাকা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলেও সমস্যা হল পিতার পিসতুতো ভাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মাঝরাতে আড্ডা দেওয়া। এই প্রসঙ্গে জলধর মল্লিক 'রেভারেন্ড লালবিহারী দে' - গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "লালবিহারীর পক্ষে ওই বাড়িতে সন্ধের সময় পড়াশোনা করা একরকম অসম্ভবই হয়ে উঠত, যদি না ওখানে কুঞ্জর মা থাকত। কুঞ্জর মা ছিল ওই বাড়ির রাঁধুনি। সে দাঁড়াতে কিংবা হাঁটতে পারত না। পক্ষাঘাতে তার পা-দুটি অবশ হয়ে গিয়েছে। হাঁটুমুড়ে বসে দুহাতে ভর দিয়ে মেঝের ওপর চলাফেরা করত। বছর চল্লিশ বয়সের এই কুঞ্জর মার গায়ের রং ছিল কালো, সামনের দাঁতগুলো ছিল উঁচু-উঁচু। সে ছিল বালবিধবা। একমাত্র ছেলেটিও মারা গিয়েছে। দেখতে কুশ্রী হলেও তার অন্তরটি ছিল মায়ামমতায় ভরা। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, ভোরবেলা উঠে লালবিহারীকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সন্ধে হলেই ঝামেলাটা দেখা দিত। বৈঠকখানায় তখন জমজমাট আড্ডার আসর বসাতেন। লালবিহারীর বাবার ওই জ্ঞাতি ভাইটি সেই আসরের মধ্যমণি। তাহলে পড়াশোনাটা লালবিহারী করবে কোথায় এখন? সমস্যার সুরাহা করল কুঞ্জর মা-ই। স্কুল থেকে ফিরলে পর কুঞ্জর মা লাল-বিহারীকে সন্ধের মধ্যে খাইয়ে-দাইয়ে তার নিজের ঘরের একপাশে শুয়ে ঘুমোতে দিতেন। তারপর রাত দুটো নাগাদ লালবিহারীকে ডেকে তুলে দিতেন। তখন বৈঠকখানা ঘরটি থাকত ফাঁকা। নিশুতি রাত। কোনো রকম গোলমাল না থাকায় ভোর অব্দি লালবিহারী খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারতেন। তখন তো এখনকার মতো বিদ্যুতের আলো ছিল না। প্রদীপ জ্বেলে পড়াশোনা করতে হত। কিন্তু প্রদীপ জ্বালাতে গেলে তো তেলের দরকার নাকি? সে তেল কেনার পয়সা কোথায় লালবিহারীর? মুশকিল আসান সেই কুঞ্জর মা-ই। রোজ রান্নার সময় সে একটুখানি করে সরষের তেল সরিয়ে রাখত। আর সেই তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে পড়াশোনার কাজটা সারতেন লালবিহারী।"[২]

পিতৃহারা লালবিহারী হিয়ার সাহেবের কাছে ভর্তি হতে গেলেন; কারণ তার ধারণা ছিল— হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে পাশ করে হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে তিনি পড়তে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেয়ার সাহেব তাঁকে ভর্তি নিলেন না। কারণ লালবিহারীর মতো খ্রিস্টান কলেজে পড়া ছেলেদের দেখে তাঁর কলেজের ছাত্ররাও খ্রিস্টান হয়ে যেতে পারে— এই ছিল তার ভয়। পিতাকে হারিয়ে লালবিহারী জীবনে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে, হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হতে না পারার মতো ঘটনা, নিশ্চয়ই তাকে খুব ব্যথিত করেছিল। যে কারণে আমরা তার জীবনীতে দেখি স্কুলের ভর্তি হওয়ার প্রসঙ্গের ঘটনাটি তিনি হুবহু কপি করে রেখেছিলেন।[৩] এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখার প্রাসঙ্গিক হবে সেটি হল প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে লালবিহারীর চিন্তাভাবনা। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার যে ভাবনার কথা তিনি ভেবেছিলেন, আমাদের মনে হয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চরম বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাকে একাজের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

সমস্যার আসু সমাধান লাল বিহারীর কাছে ছিল না ঠিকই। কিন্তু তিনি এত ছোটো বয়সেই কখনো পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার কথা একবারও ভাবেননি। বরং আরও পরিশ্রম করলেন। ভালো করে ইংরেজি শিখবেন বলে অতি কষ্টে টাকা জমিয়ে একটি অভিধান কিনলেন। কখনো আবার মুসলমান ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে পুরনো বই কিনতেন। কখনো আবার একটি বই নিয়ে পড়া শেষ করে, ফেরত দিয়ে, আরেকটি বই নিতেন। পাগলা চাচা নামের এই মুসলিম ফেরিওলাটি লালবিহারীর আগ্রহ দেখে তাকে এমনিভাবে বই দিতেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতার ফলে জ্ঞান অর্জনের পথে তাঁর কাছে কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এমন করে একটার পর একটা নতুন বই পড়ে ফেলেছিলেন সেই বইয়ের তালিকায় আছে— Addison-এর Spectator, Gibbon-এর Decline and Fall of the Roman Empire Hume-এর History of England। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কলেজে প্রবন্ধ লিখে ২৫ টাকা ও ৩৫ টাকা পুরস্কার পান দ্বিতীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রেণিতে। আবার তৃতীয় শ্রেণিতে প্রথম হয়ে Dux of the Institution বা সরদার পড়ুয়া হন। এই সময়ে সাহিত্যের পাশাপাশি গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়তেন কলেজে চতুর্থ শ্রেণীতে সংস্কৃত এবং ফরাসিও পড়েছিলেন। লালবিহারী অদম্য ইচ্ছায় ও কঠোর অধ্যাবসায় বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, উর্দ, ফরাসি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা শিখেছিলেন। দারিদ্রতা ও অভাব লালবিহারীকে দমাতে পারেনি। পরবর্তীকালে তিনি তার যোগ্যতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি ও পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলির পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে লালবিহারী ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন হিন্দু সমাজে ও তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক জীবন শুরু করেন। ধর্ম পরিবর্তন করার ফলে তিনি পিতার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের Catechist নিযুক্ত হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রচারের অনুমতি প্রাণ কালনা মিশনের অধীনে। এই সময়েই তিনি গ্রামের চাষিদের জীবনযাত্রাকে তিনি খুবই কাছ থেকে দেখেছিলেন। নিজের প্রতিদিনের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করতেন 'Journal of Preaching Tour' নামে।

উনিশ শতকে ধর্ম পরিবর্তনের যে হিড়িক দেখা গিয়েছিল তা মূলত হিন্দু ধর্মের বদ্ধমূল কুসংস্কার, আচার সর্বস্ব জীবনযাপনে অতিষ্ট হয়ে। একইসঙ্গে খ্রিস্টধর্মের ফলে তারা যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্যের নতুন নতুন দিক সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা সুযোগ পাচ্ছে বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পড়তে। এবং ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একেবারে প্রান্তিক নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে পড়াশোনা সুযোগ প্রথম তৈরি করেছিল এই খ্রিস্টান মিশনারিরাই। ফলে সাধারণ দিন-দরিদ্র মানুষ যে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্যিই ওর যে ভেদাভেদটা থেকে গিয়েছিল তা হল বর্ণভেদ। একই ধর্মের কিংবা একই দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কালো আর সাদা চামড়ার পার্থক্যের ফলে সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কালো চামড়ার মানুষেরা সাদা চামড়ার মানুষদের মতো সুযোগ-সুবিধা পেতেন না। এমনকি কৃষ্ণাঙ্গরা মিশন পরিষদের আচার্য হতে পারতেন না। এই ব্যাপারটি লালবিহারী একেবারেই ভালোভাবে নেননি। লালবিহারী এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য লালবিহারী প্রথম বাঙালি আচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনে। কালনায় চার বছর কাটানোর পর ১৮৬০ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ডাফ গির্জার আচার্য হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই সময় পর্বটি লালবিহারী দে-র জীবনে ছিল অন্যতম কঠিন সময়। চার্চে যে জায়গায় তিনি থাকতেন সেখানে ভাড়া দিতে হতো না ঠিকই কিন্তু জায়গাটা ছিল অস্বাস্থ্যকর এর ক্ষতিকারক দিকটি আমরা দেখি যখন লাল বিহারী ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বাচুবাইকে বিবাহ করে এখানে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। জলধর মল্লিক 'রেভারেন্ড লালবিহারী দে' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "কলকাতায় ফেরার পর গির্জা-সংলগ্ন আচার্যের জন্যে নির্দিষ্ট বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। এই বাড়িতে থাকার জন্যে তাকে কোনো ভাড়া দিতে হত না বটে, কিন্তু পরিবেশটি ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। এখানে তার পরপর তিনটি কন্যা আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, মধ্যম ও কনিষ্ঠ কন্যাটি আর পুত্রটি বছর তিনেকের মধ্যেই মারা যায়। এই সময়ে লালবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। পরীক্ষার ফি আর আচার্যের বেতন, সবমিলিয়ে তার আয় ছিল মাত্র দেড়শো টাকা। এই অল্প আয়ে তার ক্রমবর্ধমান পরিবারকে প্রতিপালন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উপায়ান্তর না দেখে, লালবিহারী একদিন ড. ডাফের কলেজে ১০০ টাকা বেতনে একটি আংশিক অধ্যাপকের চাকুরি দেওয়ার জন্যে আবেদন করেন। সাহেব আচার্যদের এরকম অধ্যাপকের কাজ করার নজির থাকা সত্ত্বেও ড. ডাফ লালবিহারীকে ওই রকম সুবিধে দিতে অস্বীকার করেন।
>
> এই বৈষম্যের কারণটা বুঝতে লালবিহারীর মোটেই অসুবিধে হল না। দৃঢ়চেতা লালবিহারীও ঠিক করলেন, এই বৈষম্যের উপযুক্ত জবাব দেবেন। আর সে জবাব হল আচার্যের পদ ত্যাগ করা। আচার্যের পদ পাওয়া মানে তার কাছে স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে, আত্মসম্মান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> বজায় রাখার তাগিদে লালবিহারী, অসীম মনোকষ্ট স্বীকার করেও, আচার্যের পদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।"[৪]

এরপর থেকেই লালবিহারী জীবন নতুন স্রোতে বইতে থাকে। পরপর সন্তানদের মৃত্যু এবং অর্থকষ্টের ফলে তিনি খ্রিস্টধর্ম পৌরহিত্যের পথ থেকে অব্যাহতি নেন এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাসলি ইডেন-এর আদেশে বহরমপুরে সরকারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। চার বছর পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি কলেজে বদলি হন। এই বছর থেকেই তিনি একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করেন পত্রিকাটি হল 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'। এই সময় পর্বেই লালবিহারী 'গোবিন্দ সামন্ত' বা 'বাঙালি কৃষকের জীবন' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায় যুক্ত করে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে রাধারমন মিত্র যে কথা বলেছেন তা যথার্থই। তিনি লিখেছেন—

> " 'নীলদর্পণ' যদি হয় বাঙালি কৃষকের মহানাটক, 'গোবিন্দ সামন্ত' নিশ্চয়ই তাদের মহাকাব্য। বাংলার পল্লীসমাজের ও কৃষকজীবনের এমন সর্বাঙ্গীণ নিখুঁত ছবি তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো ভাষাতেই কেউ আঁকতে পারেননি। এ-ছবি একরঙা নয়, দোরঙা। চাষির জীবনে একদিকে যেমন আছে সুখ, আহ্লাদ, তেমনি অন্যদিকে আছে কষ্ট, অশান্তি; যেমন খেলাধুলা, নবান্ন, পৌষপার্বণ, তেমনি দেশি জমিদার ও বিদেশি কুঠিয়ালের শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার। এ অবস্থায় কৃষকের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম অনিবার্য। এই সংগ্রামকে তিনি কোথাও চাপবার বা এড়াবার চেষ্টা করেননি। শিল্পী হিসাবে নিরপেক্ষতার ভান তাঁর মধ্যে নেই। নির্যাতিতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চাষিদের অপমানে নিজে অপমানিত বোধ করেন, তাদের উপর অত্যাচার হলে নিজের উপর অত্যাচার হচ্ছে মনে করে রাগে জ্বলে ওঠেন। তাদের হাজার দুর্বলতা তিনি ক্ষমা করতে পারেন, পারেন না শুধু একটি— কাপুরুষতা। যখনই তাদের মধ্যে বীরত্ব দেখেছেন আনন্দে, গর্বে তাঁর বুকে ফুলে উঠেছে। তাই তো বর্ধমান জেলার এক উগ্র-ক্ষত্রিয় চাষিপরিবারকে তাঁর গল্পের নায়ক করেছেন। কারণ তাঁর মতে সমস্ত বর্ধমান জেলায় উগ্র-ক্ষত্রিয়দের মতো এমন স্বাধীনচেতা, সাহসী বীর কৃষক সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় নেই। 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থটি পড়ে ১৮৮১ সালে জগৎ বিখ্যাত জীববৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন অযাচিতভাবে লালবিহারীর পুস্তক প্রকাশককে লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকারকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে, "গোবিন্দ সামন্ত" পড়ে আমি যেমন শিক্ষা, তেমনি আনন্দ লাভ করেছি।'।"[৫]

পর্ব - ২

রেভারেন্ড লালবিহারী দে একজন ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। একই সঙ্গে সাহিত্য রচনা, সাংবাদিকতা, সম্পাদক, সভায় বক্তার ভূমিকাও পালন করেছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। যেমন বেথুন সোসাইটি, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি। বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতা করা প্রবন্ধগুলি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান রিফর্মার' এবং ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'ফ্রাইডে রিভিউ' সাপ্তাহিক পত্রিকা আর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ১৮৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'অরুণোদয়' নামের একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার প্রকাশিত লালবিহারী দে-র প্রবন্ধগুলি[৬] হল—

১। Chaitanya and Vaisnavas of Bengal (চৈতন্য ও বাঙালি বৈয়বগণ), জানুয়ারি, ১৮৫১ সাল।
২। Bengali Games and Amusements (বাঙালির ক্রীড়া কৌতুক), জুন, ১৮৫১ সাল।
৩। Bengali Festivals and Holidays (বাঙালির পালাপার্বণ), জুলাই, ১৮৫২ সাল।
৪। Vernacular Education in Bengal (বাংলাদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা), ১৮৫৪ খ্রিঃ।
৫। English Education in Bengal (বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা), ১৮৫৬ খ্রিঃ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬। Primary Education in Bengal (বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা), ১৮৬৮ সালের ১০ ডিসেম্বর।
৭। Teaching of English Literature in the Col. Leges of Bengal (বাংলার কলেজসমূহে ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষার প্রণালী), ১৮৭৪ সালের ১৯ মার্চ।
৮। All about the Parsis (পার্শিদের সকল বিষয়ে) ১৮৭৫ সালের ২৫ মার্চ।
৯। The Rev. Dr. John Wilson (পাদ্রি ড. জন উইলসনের জীবনী) ১৮৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশিত লালবিহারীদের কয়েকটি প্রবন্ধ[৭] হল—
১। The Late Babu Kissory Chand Mitter (প্রয়াত কিশোরীচাঁদ মিত্র)।
২। Recollections of My Schooldays (আমার ছাত্রজীবনের স্মৃতি)।
৩। Teaching of English Literature in the colleges of Bengal (বাংলার কলেজগুলিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো)।
৪। All about the Parsis (পার্শিদের সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়)।
৫। The Rev. John Eilson (রেভারেন্ড জন উইলসন)।
৬। Folk Tales of Bengal (বাংলার লোককথা)।
৭। The Banker Caste of Bengal (বাংলার সুবর্ণবণিক জাতি)।
৮। Life and Labours of Dr. Carey (ড. কেরির জীবন ও কর্ম)।

এছাড়াও তার অনেকগুলি রচনা রয়েছে। লালবিহারী দে-র অধিকাংশ লেখাই ছিল ইংরেজিতে। এখানে আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অনালোচিত বা কম-আলোচিত তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। প্রবন্ধগুলির সারমর্ম বিষয়বস্তু এবং কোন দিকগুলোকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন সেগুলোকেই আমরা দেখব। একই সঙ্গে তৎকালীন যুগ সমাজকে যেমন তাঁর লেখায় পাব। সেই সঙ্গেই পাব সমকালীন নানান চিন্তার সূত্র।

প্রথমে আমরা 'Chaitanya and Vaisnavas of Bengal' প্রবন্ধটি দেখব। প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকিয় জানুয়ারি, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। লালবিহারী দে এখানে ধর্মপ্রাণ বাঙালির চরিত্র ও তাঁদের কর্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্মের প্রতি বাঙালির বিশ্বাস এতটাই যে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তা যেমন ব্যাপ্ত তেমনি প্রাত্যহিক জীবনে সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপেই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। হিন্দু ধর্মের নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন লালবিহারী দে। সেখানে বৈদিক সর্বেশ্বরবাদের যুগ, বৌদ্ধধর্মের যুগ এবং পৌরাণিক বহু দেবতা বাদের যুগ। একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে রাখতে চেয়েছেন শাক্ত, শৈব্য এবং বৈষ্ণব। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লালবিহারী দে মূলত বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বৈষ্ণব-কে বিষ্ণুর উপাসক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দেবতা যিনি তিন জগতের রক্ষাকর্তা ও ধারক স্বর্গীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষক এবং মানুষের ত্রাণকর্তা। তিনি বৈষ্ণবদের ভক্তি ও ধ্যানের অবলম্বন। বৈষ্ণবদেরকে চারটি প্রধান সম্প্রদায় বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হল— শ্রী সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং সনক সম্প্রদায়। এই শ্রেণিগুলিরই আবার অনেকগুলি উপবিভাগ রয়েছে। লালবিহারী দে বৈষ্ণবদের চৈতন্য অনুসারী ধারাটিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলার আধুনিক বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। প্রাবন্ধিক নদিয়ায় চৈতন্যদেবের প্রসার এবং সারা বাংলায় বিস্তারের পেছনে কতগুলি কারণ কে উল্লেখ করেছেন। যেমন সরলতা বিদ্যমান ধর্মীয় ধারণার সাথে এর মৌলিক সামঞ্জস্য, জনগণের সীমাহীন অন্ধবিশ্বাস এবং বৈষ্ণবদের উৎসাহ। এই সমস্ত কিছু বাদ দিলেও একথা মাথায় রাখতে হবে, ধর্মের প্রসারের পেছনে চৈতন্যদেবের নিজের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। লালবিহারী দে, চৈতন্যদেবকে মুহাম্মদ বা লয়োলার সঙ্গে তুলনা না করে, টাইয়ানার অ্যাপোনিয়াস বা অ্যাবোনোতেইকোসের আলেকজান্ডারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চৈতন্যদেব এবং বাংলার বৈষ্ণবদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন লালবিহারী দে। একটি হল লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল', এখানে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অপরটি হল কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এই গ্রন্থটিকে বৈষ্ণবরা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। এই গ্রন্থে তিনটি ভাগ আছে — আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্তলীলা। আদিলীলায় চৈতন্যদেবের শৈশব ও যৌবনের বিবরণ রয়েছে। মধ্যলীলায় আছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ এবং বিভিন্ন তীর্থযাত্রার কথা। এবং অন্তলীলায় আছে চৈতন্যদেবের উপদেশাবলী, চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদের কার্যকলাপ, তাঁর গভীর ধ্যান এবং ভাবাবেশের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলায় রচিত হলেও শ্রীমদ্ভাগবত গীতা থেকে প্রচুর সংস্কৃত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। জেলে রমণীদের মুখের ভাষা এবং হিন্দুস্তানি ও ওড়িয়া ভাষার মিশ্রণ দেখা যায় সেখানে। প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "The style is quite unique. Difficult Sanskrit stanzas alternate with the most vulgar gibberish spoken poken by fisherwomen. fisher There is also a good sprink-ling of the Hindustani and the Uriya. Its literary qualities are certainly not of the highest order. It is written in wretch-ed taste. Tedious descriptions of the most trifling things fill whole pages. The recital of the various dishes in feasts, in honour of Chaitanya, sometimes takes up two mortal pages. It is written in poetry, that is, in jingling rhyme; for there is no real poetry-not a spark of it from beginning to end".[৮]

এরপরেই চৈতন্যদেবের জীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন লালবিহারী দে। শ্রীহট্টের (সিলেট) উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ (নদিয়া) গ্রামে চলে এসেছিলেন। জগন্নাথের স্ত্রী ছিলেন শচীদেবী। বিশ্বরূপ ছিলেন তাদের প্রথম সন্তান। দ্বিতীয় সন্তান চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব তেরো মাস, গর্ভে ছিলেন, তারপর পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। চরিতামৃতের রচয়িতা ভক্ত কৃষ্ণদাস তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন এমন ভাবে— "সত্যের সেই নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, যা তিন জগৎকে আলোকিত করতে এসেছিল, নদীয়ায় উদিত হওয়ায়, আকাশের কলঙ্কিত চাঁদ রাহু দ্বারা গ্রাস হয়েছিল।"

এই প্রসঙ্গে লালবিহারী দে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যদেব; খ্রিস্টধর্মের মহান সংস্কারক লুথারের জন্মের দুই বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব শৈশবে নম্র, বিনয়ী ছিলেন না, বরং তাঁর উদ্দাম, চঞ্চল দুষ্টুমির জন্য লোকে অতিষ্ট হয়ে উঠত। লালবিহারী দে তাঁর লেখায় জানিয়েছেন যে লোচন দাস যেমন ভাবে চৈতন্যের শৈশবের বর্ণনা করেছেন, তিনি তেমন করবেন না। তিনি কেবল তার জীবনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে তার উপর আরোপিত অলৌকিক ঘটনাগুলো এড়িয়ে— হরি নামের রহস্যে দীক্ষিত একটি কুকুরের স্বর্গে গমন— তার কথিত ভবিষ্যদ্বাণী— তার করা ছোটখাটো চুরির ঘটনা এবং যে সরলতার সাথে সে তার মায়ের কাছে চাঁদ চেয়েছিল, যাতে সে তা নিয়ে খেলতে পারে। তার প্রতিভার অকালপক্কতা গুলিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। চৈতন্যদেব ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কাব্যের প্রচলিত পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করেন। অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি পরিচিতি লাভ করেন। যখন চৈতন্যদেব জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন, ঠিক তখনই তাঁর বড় ভাই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরেই নিমাই লক্ষ্মীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সময়েই বৃদ্ধ জগন্নাথ মারা যান, এবং এরপর নিমাই একজন স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন। তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেক ছাত্রকে আকৃষ্ট করেছিল।

অধ্যাপনার কাজ করার সময় তিনি পূর্ববঙ্গের দিকে একবার ভ্রমণ করেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের বৈচিত্র্য ও গভীরতায় সেখানকার মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। বাড়ি ফিরে জানতে পারেন তার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া মারা গেছেন। মায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন; এবং কিছুদিন পরে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গিয়েছিলেন। লালবিহারী দে-র মতে, বহু গ্রন্থ আছে জাতি, জনগণ এবং ভাষার উপর বিশাল প্রভাব ফেলে। যেমন-- নবীর মন্তব্য ও কোরানের বাণী সমাজে বহু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, বাইবেল গ্রন্থের ফলে অগণিত কল্যাণ হয়েছে যার হিসাব করা যায় না। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের পর, যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ মধ্যগগনে ছিল, তখন বেদ ছিল সেই যুগের গ্রন্থ। বেদের পরে পুরাণ যুগের প্রচলিত হয়, যা আজও তার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। চৈতন্যদেবের সময়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে পুরাণটি শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে 'প্রধান গ্রন্থ' বলে বিবেচিত হত, তা ছিল শ্রীমদ্ভাগবত।চৈতনদেব গভীর মনোযোগ সহকারে এই বইটি পড়েছিলেন। এটি তাঁর মনকে পূর্ণ করেছিল, তাঁর আত্মাকে গঠন করেছিল এবং তাঁর কল্পনাকে রঞ্জিত করেছিল।

গয়া থেকে ফিরে আসার পরেই নিমাইয়ের মধ্যে বেশকিছু পরিবর্তন আসেছিল। ভ্রমণের সময় 'কৃষ্ণের প্রেমের ঐশ্বর্য' খুঁজে পেয়েছিলেন, যা তিনি সারা বিশ্বে প্রচার করার সংকল্প করেছিলেন। কৃষ্ণের উপর সমগ্র ধ্যান তাঁর মনের অবস্থা উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দিন-রাত একই ভাবে বলতেন— "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি বল! হরি বল!" তাঁর নিজের গ্রামই ছিল তাঁর কর্মজীবনের প্রথম ক্ষেত্র। তিনি সহজেই নদিয়ার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে নিজের দলে টানলেন। নদিয়া গ্রাম হরি নামে মুখরিত হয়ে উঠল। গৌরহরি (চৈতন্যদেবের আরেক নাম) তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সারারাত রাধা ও কৃষ্ণের স্তবগান করতেন; মথুরার গোপীদের প্রেমলীলা নিয়ে আলোচনা করতেন; কাঁদতেন, হাসতেন এবং নৃত্য করতেন। এই প্রসঙ্গে লালবিহারী দে চৈতন্যদেবের একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন একটি আমের আঁটি মাটিতে পুঁতে তৎক্ষণাৎ সেটি গাছ হয় এবং গাছ থেকে ফল পেড়ে বৈষ্ণব ভক্তগণ খেয়েছিলেন।

এরপর চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতের দিকে হরি মাহাত্ম্য প্রচারের পথে তিনি রামায়ণে বর্ণিত সমস্ত বিখ্যাত স্থান পরিদর্শন করেন। পঞ্চবটীর সমভূমিতে বাল্মীকির অমর কাব্যে সংরক্ষিত প্রাচীন কালের স্মৃতিগুলো তাঁর মনে ভিড় করে আসে— শূর্পণখার অঙ্গহানি, মারীচের হত্যা, সীতার অপহরণ এবং বীর রাঘবের অসীম শোক। রামেশ্বরম থেকে তিনি একই পথে ফিরে আসেন এবং ভক্তদের অনুপ্রাণিত করেন। এইভাবে, চৈতন্য নীলাচলে ফিরে আসেন।

এই সময় পর্বে জগাই মাধাই এর কাহিনি, অদ্বৈতানন্দের বাড়িতে চৈতন্যদেবের আগমন। এবং দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সংকল্প করে, নিত্যানন্দ কে সঙ্গী করে উড়িষ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নীলাচল হয়ে উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে তিনি দক্ষিণ দেশে রামেশ্বরমের দিকে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রা পথে প্রচুর মানুষ চৈতন্যর মুখে হরিধ্বনি শুনে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় গোদাবরী নদীর তীরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এবং কাবেরী নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণের সাথে চার মাস অতিবাহিত করে তাকে শিষ্য হিসেবে দীক্ষা দেন। এরপর নীলাচলে চৈতন্যদেবের ফিরে আসার পরে ভক্তগণ আপ্লুত হন। কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন— কীর্তনের ধ্বনি ত্রিভুবন পূর্ণ করেছিল। রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনের জন্য তিনি উপস্থিত হয়েছেন। এখানে একটি কাহিনির কথা লালবিহারী দে আমাদের জানিয়েছেন। অনেকের কাছেই ঘটনাটি জানা। বৈষ্ণবদের উন্মত্তকারী মৃদঙ্গের শব্দ এতটাই মোহনীয় ছিল, চৈতন্যর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এতটাই লাবণ্যময় ছিল এবং ভক্তদের গান এতটাই সুমধুর ছিল যে, রথটি রাস্তার মাঝখানে থেমে গেল এবং সেই প্রভুপ্রতিম দেবতা স্থির দৃষ্টিতে সেই পুণ্যময় দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এমন সময় জগন্নাথের রথটি নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। অগণিত জনতা সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়েছিল। পুরীর রাজার বিশালকায় হাতিগুলোও রথটিকে সরাতে পারেনি। এই বিপর্যয়ে তীর্থযাত্রীদের দুঃখের কোনো সীমা ছিল না। চৈতন্য তাদের উদ্ধারে এগিয়ে এলেন। তিনি মাথা দিয়ে রথটিকে ধাক্কা দিলেন এবং রথটি চলতে শুরু করল। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় বাংলার বৈষ্ণবরা পুরীতে এলে এই দৃশ্যগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটত।

এইভাবে চার বছর কাটানোর পর, চৈতন্য অল্প কয়েক দিনের জন্য বাংলায় আসেন, তার মায়ের সাথে দেখা করেন এবং তার শিষ্যদেরা উজ্জীবিত হন তাকে দেখে। এরপর তিনি বৃন্দাবন তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তার একনিষ্ঠ শিষ্য বলভদ্রকে সাথে নিয়ে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু সাধারণ পথ ছেড়ে কটকের বাম দিকের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন, মুখে ছিল কৃষ্ণের নাম, যার ধ্বনিতে বাঘ ও হাতিরা তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও বন্য শূকরের পালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে প্রাবন্ধিক লিলবিহারী দে নানান অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এমনি করেই তিনি বারাণসীতে পৌঁছলেন। প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হয়ে যমুনা নদীতে স্নান করেন। এরপর মথুরা এলেন। সব পবিত্র স্থানগুলি তিনি দর্শন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন— বৃন্দাবনের পবিত্র নগরী মহাপ্রভুর রূপান্তরের বর্ণনা দিতে দশ কোটি খণ্ড বইও যথেষ্ট হবে না। উড়িষ্যায় ফেরার পথে এলাহাবাদ ও বারানসীতে তার বিখ্যাত শিষ্য স্বরূপ ও সনাতনের সাথে তত্ত্ব আলোচনা করেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের একষট্টিটি অর্থ প্রয়োগ করেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এরপর নীলাচলে বারো বছর কাটান। সেই সময় শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, বাংলার বৈষ্ণবদের কাছ থেকে সাক্ষাৎ ও পূজা গ্রহণ করেন। এই সময় প্রায়শই তিনি উন্মাদনার আবেশে থাকতেন। উন্মাদ অবস্থায় তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক মাধ্যমে দেহ ত্যাগের কথা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তৃতীয় খণ্ডের ১৮ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

লালবিহারী দে তার প্রবন্ধে জানিয়েছেন— বৈষ্ণবরা কেবল একটি সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন— তা হল কৃষ্ণ। এই ধারণা স্পিনোজার মতো, যার ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা ছিল কেবল প্রাচ্য সর্বেশ্বরবাদেরই এক পরিবর্তিত রূপ। বৈষ্ণবরা মনে করেন চৈতন্যদেব হলেন হিন্দু শাস্ত্রের পূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সমস্ত অবতারের অংশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ভক্তির মতবাদ বা বিশ্বাস। লেখক লালবিহারী দে-র মনে হয়েছে বেদান্ত এবং সমস্ত প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে এটির অভাব আছে। এই প্রসঙ্গে বেদান্ত দর্শন ও হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

লালবিহারী দে প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন— বৈষ্ণব ধর্ম অন্যান্য সকল প্রকার গোড়ামির মতোই জ্ঞানকে বর্জন করে, অন্ধ ভক্তি বা জ্ঞানের ভিত্তিবিহীন বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। প্রাবন্ধিক দে এখানে চমৎকার ভাবে বলেছেন— যেখানে বেদান্তবাদ তার অনুসারীদের কাছে জ্ঞান ও বিমূর্ততা দাবি করে; যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। এবং হিন্দু ধর্মের একাধিক আচার অনুষ্ঠানের বিধান দেয়, যা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পালন করতে হয়। সেখানে চৈতন্যদেব কেবল একটি বিশ্বাস ও মানসিক অনুভূতির উপরে জোর দিয়েছিলেন।

ভক্তির পাঁচটি স্তর হল— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মথুর। প্রাবন্ধিক এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমরা সে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। তবে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন অংশগুলিকে তিনি ভালোভাবে নেননি তিনি আমাদের জানিয়েছেন—

> "It is impossible, indeed, to read without feelings of horror the disgusting and licentious manner, in which the union of Rádhá and Krishna is detailed in the sacred books of the Vaishnavas."[৯]

আরও জানিয়েছেন, যে যখন ইউরোপীয় মহাদেশে মার্টিন লুথার কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের পুরনো কিন্তু তখন বিস্মিত মতবাদটি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তখন বাংলার বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিবাদের মতবাদের মিথ্যা রূপটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

> "It is interesting and curious also to mark that while Luther on the European continent was reviving the old, but then forgotten, doctrine of justification by faith alone, the founder of the Vaishnavas in Bengal was ex-pounding its false show in the doctrine of the Bhakti."[১০]

বৈষ্ণবদের শিষ্যকে গুরু মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া এবং গুরু-কে স্বয়ং হরি মনে করা এবং এমন নানা উপায়ে গরুর আর্থিক উপার্জনের নানান ফন্দিফিকির-কে লালবিহারী দে পুরোপুরি ভাবে ভন্ডামি ও মিথ্যাচার বলে তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এমনকি গরুর খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়, প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় সবটা গুরু খেতে পারবে না, এটা জেনেও। তিনি খাওয়ার পর যেটুকু বেঁচে থাকে সেই এঁটো খাওয়ার বাড়ির লোকেরা খায়। এই ধরনের প্রথাকে লালবিহারী ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> "The Gurú Pádásra is a melancholy proof of the utter prostration of hu-manity under the despotic sway of a most galling superstition, and of the audacious height to which imposture has reached. Degrading as were the superstitions of ancient Greece and Rome, there was nothing in them at all equal to it. Intolerable and overbearing as was the priest-craft of the church of Rome, during the dark ages, it devised nothing so base and disgusting as the Gúrú Pádásraya of the Gosains. It has been said that the original founders of Vaishnavism ought to be absolved from the guilt of devising this vile rite."[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এরপরে তিনি বেশ কিছু বৈষ্ণবী ও অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন— রাধা অষ্টমী, নন্দ উৎসব, রথযাত্রা বা রাসযাত্রার মতো উৎসবের কথা বলেছেন। ধর্মীয় বিষয়ক কাব্য আবৃতি করে শোনানোর একটি পেশা একসময় বাংলায় ছিল। ভাগবত গীতা পাঠ বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন কেউ কেউ। লালবিহারী দে এখানে অন্যান্য দেশের এই ধরনের কথকদের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—প্রোভেন্সের ট্রুবাদুর, জার্মানির মিনেসঙ্গার, এবং ইতালির ইমপ্রোভিসাতোবি। বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্বের বিশ্বাস ও করণীয় দিকের প্রতি অতি দৃষ্টিপাত করেছেন, এমনকি তাদের আচার-আচরণ বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। তার ভাষায়—

> "We need not say that this pernicious custom is the fruitful mother of a thou-sand immoralities. Indeed it is doubtful whether a set of more immoral men, than the lowest sort of the Vairagis, is to be found in all Bengal. We will not outrage the feelings of the reader by detailing the atrocities of the Nerás and Neris, a species of male and female Vaishnava vagrants. They are justly reckoned by the mass of the Hindu population as monsters of iniquity and the pests of society."[১২]

বৈষ্ণব ধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতা হল জাতিভেদের বন্ধন ভেঙে ফেলা। কিন্তু ভারতীয় সমাজে বৈষ্ণবরা জাতিভেদকে এখনও কঠোরভাবে মান্য করে, লালবিহারী দে মনে করেছেন এই প্রথাটি এমনভাবে বৈষ্ণব সমাজে বা হিন্দু সমাজের প্রথিত আছে যে এরা নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললেও বৈষ্ণবরা সমাধিস্থ করে।

বৈষ্ণবদের দুটি ধর্মদ্রোহী মতবাদ হল স্পষ্টদায়ক এবং কর্তাভজা। স্পষ্টদায়করা দাসসুলভ ভক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন, অন্যরা গুরু কে প্রদর্শন করে থাকে পুরুষ ও মহিলা ভক্তদের মধ্যে একটি রহস্যময় সম্পর্ক থাকে এখানে, যা ইউরোপের বেলজিক ও জার্মান বেগার্ডদের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কের মতোই।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবী ধর্মটি যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তা বাহ্যিক নয়; কারণ এর অনেকটাই যে অত্যন্ত স্থূল অর্থে বাহ্যিক তবুও লালবিহারী দে একথা স্বীকার করেছেন যে হৃদয়কে আবেগ ও অনুভূতিসহ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়নি। চৈতন্যর প্রবর্তিত ব্যবস্থাটি হিন্দু ধর্মের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংযোজন। লালবিহারী দে-র মতে, চৈতন্যদেবের ধর্মীয় জাগরণটি কোনও একচেটিয়া অধিকারের বিষয় নয় বরং শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই সমান, কোন ভেদাভেদ নেই এখানে। এরপরেই তিনি মন্তব্য করেছেন সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যেই খ্রিস্টধর্ম বিশ্বের সর্বজনীন ধর্ম হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

> "Unlike too the multitudinous rites and ceremonies prescribed in the Hindu rituals, it proclaims the omnipotence of one principle, and the vast efficacy of one religious duty. In insisting on Bhakti, as a sine quâ non of personal religion, it has made a faint approximation to faith, that prolific prin-ciple of the Christian revelation."[১৩]

চৈতন্যের প্রবর্তিত ব্যবস্থাটি হিন্দু ধর্মের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংযোজন। লালবিহারী দে তাঁর দীর্ঘ লেখায় যেমন চমৎকার ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়েও, সংক্ষিপ্তভাবে, সহজভাবে, বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ছন্ন দিকগুলিকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি অন্য দেশের অন্য মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কোন কোন জায়গাগুলিকেও তিনি দেখিয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি যেহেতু খ্রিস্ট ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাই তিনি খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন।

সর্বোপরি আমাদের মনে হয় কল্যাণকারী যেকোন মানুষের পক্ষেই শুভ ও মঙ্গলময় জীবনের পথেই ধাবিত হওয়া উচিত। সেখানে ধর্মীয়ভাবেই হোক আর ধর্ম ছাড়াই হোক সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দেড়-শতক আগে লেখা লালবিহারী দে-র লেখাটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

লালবিহারী দে-র একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলার সুবর্ণ বণিকদের নিয়ে। রচনাটির নাম 'The Banker Caste Of Bengal'।[১৪] তিনি 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। আমরা জানি লালবিহারী দে বর্ধমান জেলার সোনপলাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটির বেশিরভাগ মানুষই ছিলেন সুবর্ণ বণিক। লাল বিহারীর প্র-প্রপিতামহ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বৈষ্ণবচন্দ্রর দে মন্ডল এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিজের চেয়ে অঞ্চলের বাসিন্দা সেখানকার পেশা নিয়ে তিনি আকর্ষণ বোধ করবেন। লালবিহারী দে-র ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এমনটি ঘটেছিল। আমরা এই প্রবন্ধটিতে লালবিহারী দে কোন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখেছেন সেটুকু দেখার চেষ্টা করব।

এই সুবিশাল হিন্দু প্রধান দেশে, হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির গঠনগত ইতিহাস নেই। প্রাকৃতিক ইতিহাস বা ভূতত্ত্বের ইতিহাসের মতো যদি তা থাকতো তবে জাতিগুলির অনেকটা সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যেত। তবে এটা ঠিকই হিন্দু জাতি ও উপজাতি গুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস হয়তো সম্ভব নয়। কারণ সময়ের করাল গ্রাসে অনেক কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রচলিত কাহিনি, কিংবদন্তি থেকে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। লালবিহারীদে বাংলার সুবর্ণ বনিকদের ইতিহাসটিকে তেমনভাবেই দেখার চেষ্টা করেছেন। বাংলার হিন্দুদের সামাজিক ব্যবস্থায় সুবর্ণ বণিকরা পূর্বে উচ্চস্থানে অবস্থান করলেও বর্তমানে সেই স্থান নেই কিন্তু তারা যে খুব প্রভাবশালী শ্রেণি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কলকাতার বিখ্যাত কোটিপতি শ্যামাচরণ মল্লিক, বাবু মতিলাল শীল, উদ্যোগ প্রতি বাবু দুর্গাচরণ লাহিড়ী। এরা সবাই সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। রায় রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক বাহাদুর ও মতিলাল শীল দরিদ্রের প্রতি দানশীলতায় ক্ষেত্রে জনমানসে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

লালবিহারী দে-র সময়কালের কিছু পূর্বে কলকাতার কিছু রাজা সুবর্ণ বণিক ছিলেন। বড়বাজার, পাথুরিয়া ঘাটার মল্লিকরা, চুঁচুড়ার শীলরা এবং অন্যান্য ধনী পরিবার গুলির পূর্বপুরুষের প্রাচীন গৌরব কিছুটা ম্লান হলেও তারা তখনও বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। এত ধনী এবং প্রভাবশালী একটি শ্রেণির উৎপত্তি সামাজিক ইতিহাস আচার-আচরণ, রীতিনীতি এবং ধর্মীয় দিকগুলি সর্বদাই যে সমান থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় সামাজিক উত্থান পতনের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে। এটা সকলেরই জানা যে হিন্দুরা প্রথমত চারটি বর্ণ ছিল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা মূলত শিক্ষক ও পুরোহিত হত, ক্ষত্রিয়রা রাজ্য শাসন করত, বিদেশি আক্রমণের থেকে রক্ষার দায়িত্বে থাকত, বৈশ্যরা সম্পদের বিকাশ এবং বাণিজ্য করত। শূদ্ররা উপরোক্ত তিনটি শ্রেণির সেবায় দাস হিসেবে নিযুক্ত থাকত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের ফলে বিভিন্ন মিশ্র এবং সংকর জাতিও তৈরি হয়েছিল। মনু শূদ্রদেরকে ঊনত্রিশটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে বৈদ্য বা চিকিৎসক জাতি। সুবর্ণ বণিকরা স্বর্ণ ব্যবসায়ী, তারা দাবি করেন সমস্ত শূদ্রদের চেয়ে কায়স্থ ও বৈদ্যসহ সমস্ত মিশ্র জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষতদের চেয়ে নিকৃষ্ট সমান বণিকরা কয়েকটি দাবি করেছেন যা সংক্ষেপে লালবিহারী দে তুলে ধরেছেন— প্রথমত, বাংলা রাজা বল্লাল সেনের জীবনীকার বা 'বল্লাল-চরিত্র'-তের রচয়িতা আনন্দভট্ট তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভারতের প্রাচীনতম আর্যায়িত প্রদেশ গুলির মধ্যে অন্যতম অযোধ্যা। এই অযোধ্যার রামগড়ের একজন বৈশ্য সনক আঢ্যই ছিল বাংলার স্বর্ণ বণিকদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যখন বৌদ্ধ ধর্মের বিজয়ের ফলে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বহু মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় ধার্মিক বিদ্বান এবং বেদে পন্ডিত সনক বাংলায় চলে আসেন। তখন বাংলায় বৌদ্ধশাসকের অবসান ঘটেছিল এবং বাংলার রাজদণ্ড তখন আদিশূরদের হাতে। বাংলার রাজা সেই সময় সনদদের বসবাসের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, বৈশ্য এবং বণিক সমার্থক শব্দ। সংস্কৃত অভিধানে বলা হয়েছে— "বৈশ্যস্ত ব্যবহর্ত্তা বিট বার্ত্তিক : পণিতোবণিক।"[১৫] বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থে বণিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"পটন দ্বিজো বাগৃষভত্ব মীয়াৎ
ক্ষত্রাঞ্চয়ো ভূমি পতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্রজনঃ পণ্য ফলত্ব মীয়াৎ
শূম্বন্রহি হি শূদ্রোঽপি মহাত্বমীয়াৎ।।"[১৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ যদি কোন ব্রাহ্মণ রামায়ণ পাঠ করেন তবে তিনি বাগ্মিতা লাভ করবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় এটি পাঠ করেন তবে তিনি ভূমির আধিপত্য লাভ করবেন। যদি কোন বৈশ্য এটি পাঠ করেন, তবে তিনি ধন-সম্পদ লাভ করবেন এবং যদি কোনও শূদ্র এটি পাঠ করতে শোনেন তবে তিনি মহত্ত্ব লাভ করবেন।

বাল্মীকি বৈশ্য ও বণিক শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করতেন। তবে সুবর্ণ বণিকরা যে বৈশ্য এটা সহজে বলা যায় না। বাংলার রাজা আদিশূরের দেওয়া উপাধি ছিল সুবর্ণ বণিক। কারণ হিসাবে লালবিহারী দে জানিয়েছেন— সনক আঢ্য যখন সুবর্ণগ্রামে বসতি করে, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন, তখন তিনি আরাকান, বার্মা, চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য করতেন। তার কর্ম দক্ষতার জন্য রাজা আদিশূর একটি তাম্রলিপি উপহার দেন, সেই শিলা লিপিতে লেখা ছিল—

"স্বর্ণ বাণিজ্যিকারিত্বদাত্রস্থিত বিশাংময়া।
সুবর্ণ বণিগিত্যাখ্যাদত্তা সম্মানবর্দ্ধয়ে।।"[১৭]

এই লেখাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সুবর্ণ বণিক উপাধি এবং তাদেরকে বৈশ্য হিসেবে রাজা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, লালবিহারী দে মনে করেছেন যে, মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' গ্রন্থের দশম অধ্যায় বর্ণশংকর বা মিশ্র জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণির একটি তালিকা দিয়েছেন, সেখানে কিন্তু সুবর্ণ বণিক শ্রেণি নেই। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মনুর সময়ে সুবর্ণ বণিকরা বৈশ্য নামে পরিচিত ছিল।

চতুর্থত, মনু তাঁর বিধিমালার দশম অধ্যায় সুবর্ণ বণিক এবং বৈদ্যদের মধ্যে বেশ কয়েকটি উপাধি বা পারিবারিক পদবির উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল— সেন, দাস, দত্ত, চন্দ্র, ধর ইত্যাদি। বর্ণসঙ্কর বা মিশ্র জাতির মধ্যে পারিবারিক নাম প্রাপ্তির বিষয়ে মনু বলেছেন—

"পুত্রা যে ২নন্তরস্ত্রীজাঃ
ক্রমেনোক্তা দ্বিজন্মানাং।
তানন্তর নাম্নস্তু
মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে।।"[১৮]

অর্থাৎ বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তান ছিলেন অথবা সুবর্ণ বণিকরা ব্রাহ্মণের পিতা এবং বৈদ্য মাতার সন্তান ছিল। প্রথমটি মনু স্বীকার করেছে। ফলে বলা যায় বৈদ্যরা তাদের পারিবারিক নাম এখন যারা সুবর্ণ বণিক তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। পূর্বে এরাই বৈশ্য হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এখন বলা প্রয়োজন যে উত্তর ভারতের আগরওয়ালরা যারা নিজেদের প্রকৃত বৈশ্য বলে দাবি করেন, তাদের কিছু পারিবারিক পদবি ছিল। যেমন— পাল, সেন। সুবর্ণ বণিকদের থেকেই সেগুলি গৃহীত বলা যায়।

পঞ্চমত, আমরা দেখি যে বিভিন্ন শ্রেণির পেশা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতিগত ভাবে বিভক্ত ছিল। যদি তখন অনেকটা তার পরিবর্তন ঘটলেও লালবিহারী দে মূলত পূর্বপুরুষদের পেশাকে নিয়ে যারা আঁকড়ে থাকেন তাদের কথাই বলেছেন। মনু চারটি বর্ণের মানুষকে আলাদা আলাদা কাজের বিধান দিয়েছিলেন, লেখক লালবিহারী দে মনুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> "Manu distinctly says that wealth is to be accumulated only by the Vaisyas, The Brahman is to devote is life to study and to religion; the Kshatriya to government and to feats of arms; the Sudra to monial service; it is the province of the Vaisya alone to accumulate wealth. And it is a singular fact, that the richest people in Bengal have been in former days, and are at present, the Suvarna-Vaniks."[১৯]

ষষ্ঠতম, গায়ের রঙের ভিত্তিতে জাতি নির্ধারণের কথা ও এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তিনি বলেন বিশুদ্ধ আর্য রক্ত যেসব হিন্দুর মধ্যে আছে তারা অন্যান্য মিশ্র হিন্দু জাতির তুলনায় বেশি ফর্সা। যদিও ব্রাহ্মণদের সবাইকে ফর্সা এমন বলা যায় না। কাকের মতো কালো ব্রাহ্মণও আছে। তবুও লালবিহারী দে মনে করেছেন, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মতোই ওদের বা বাংলার সুবর্ণ বণিকদের গায়ের রং ফর্সা তাই তারা বিশুদ্ধ আর্য বংশভূত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপরোক্ত ছয়টি যুক্তির মাধ্যমে লালবিহারী দে সুবর্ণ বণিকদের বাংলায় আগমনের ইতিহাসটি বলেছেন। একই সঙ্গে মনুর দৃষ্টান্ত নিয়েও আদি সূর্যের শিলালিপির তথ্য নিয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে সুবর্ণ বণিকরা কোন মিশ্র বা সংকর জাতি নয় পূর্বের মতোই বর্তমানে প্রভাবশালী বাংলার এই জাতিটি বিশুদ্ধ আর্য জাতি থেকে উদ্ভূত। সুবর্ণ বণিকরা জাতিগতভাবে কায়স্থ ও বৈদ্যে এদের চেয়ে কিছুটা বেশি সম্মান পান এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মতোই বেদ পাঠ করার ও পৈতে নেওয়ার অধিকার ও তাদের রয়েছে। প্রাবন্ধিক লিখেছিলেন –

> "...which represent them to have been descended from a wealthy Vaisya gentleman of Ayodhya, it appears from these facts, that the Suvarna-Vaniks are not a Mixed Caste, but pure-blooded and twice-born Vaisyas; that they are, therefore, superior to and more honourable-so far as the distinction of caste is concerned than Kayasthas and Vaidyas; and that they are, consequently, as much entitled to read the Vedas and to wear the sacred thread as Brahmans and Kshatriyas."[২০]

লালবিহারী দে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ সুবর্ণ বণিক জাতিটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যের বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সত্যকে মান্যতা দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদিও প্রবন্ধটি আজ থেকে দেড়-শতক বছর পূর্বে লেখা এবং বর্তমানে এ নিয়ে বহু নতুন তথ্য এসেছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় উনিশ শতকে আঙ্গিনায় লালবিহারী দে-র এই সংযোজনটি নিঃসন্দেহে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বাংলার সুবর্ণ বণিক বিষয়ক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লালবিহারী দে-র গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন সুবর্ণ বণিকরা একসময় বহিষ্কারের অন্যতম হিসেবে সামনে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ারদের দিকে কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে সেই মর্যাদা হারাতে শুরু করেছিল এমনকি কোন ব্রাহ্মণ যদি সুবর্ণের ছায়া মারা তো তবে সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হতেন এই সুবর্ণ বণিক শ্রেণির আভিজাতির জায়গা থেকে সংকর বা মিশ্র বর্ণের শ্রেণি হিন্দুদের স্থান স্থানে চলে আসে তার কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

বল্লাল সেনকে আমরা বাংলায় ব্রাহ্মণ্য বাদ এর অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে চিনে থাকি। তবে তাঁর সঠিক পরিচয় জানা যায় না। আদিশূরের পুত্র বা বিজয় সেনের পুত্র বা শক সেনের পুত্র বা ব্রহ্মপুত্রের পুত্র এমন নানারকম মত রয়েছে বলে লালবিহিরী দে আমাদের জানান। তিনি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় রাজত্ব করতেন। সেই সময় সুবর্ণ বণিকদের গোত্রের প্রধান ছিল বল্লবলিয়ানন্দ, যিনি সনক আঢ্যের বংশধর এবং রাজ্যের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বল্লাল সেনের জীবনীকার আনন্দ ভট্টের থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর কাছে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন সোনার মোহর ছিল যার মূল্য ছিল তৎকালীন সময়ে প্রায় ২২৪ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং এর সমান।

বল্লাল সেন ছিলেন অমিতব্যয়ী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেই কারণে প্রায় তিনি টাকা ধার করতেন। একবার তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের স্বাধীন রাজ্য মনিপুরের সাথে যুদ্ধে জড়ান। সুবর্ণ বণিক বল্লভের কাছে ২৫ লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন এবং আরও ৫ লক্ষ টাকা তিনি ধার নেন এবং শর্ত ছিল তিনি আর ঋণ নেবেন না। যদি যুদ্ধ বেশিদিন চলে তবে তিনি যুদ্ধ থামিয়ে সন্ধি চুক্তি করবেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় রাজা পুনরায় পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলেন। কিন্তু বল্লভানন্দ ঋণ দিতে অস্বীকার হলে বল্লাল সেন বণিকদের এই বর্ণের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করেন করেন। বল্লাল সেন একজন নারীকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং সুবর্ণ বণিকদের একদল যুবক এই বিষয়টি নিয়ে অভিনয় করেছিল এর ফলে বল্লাল সেনের আরও অসুন্তুষ্টি বেড়ে যায়।

দিনে দিনে সুবর্ণ বণিকদের স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরতা রাজা মেনে নিতে পারেননি। এই সময়ই বল্লালের অনৈতিক কাজের জন্য তার পুত্র তাকে চিঠিতে তিরস্কার করেছিলেন এবং এর ফলস্বরূপ পূর্বোক্ত ডোম রমনীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। অনুষ্ঠান এবং প্রায়শ্চিত্ত করে প্রজাদের দান ধ্যান করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লালবিহারী দে লিখেছেন—

> "The biographer of Ballál Sen, Ananda Bhatta, informs us that on receiving this message the King said in an assembly of Brahmans-"If I do not degrade the Suvarna-Vaniks as a caste, let me be accursed, let me be accounted as great a sinner as a cow-killer, or as the murderer of a Brahman or of a woman. As Bhima Sen had vowed to

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> destroy The hundred sons of the blind king Dhritarashtra, so do I vow to ruin the Suvarna-Vaṇiks."[২১]

ফলে বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের উচ্চশ্রেণি থেকে নিম্নবর্গের শ্রেণিতে নামাতে বদ্ধপরিকর হলে উঠেছিলেন। যদিও সুবর্ণ বণিকরা খুবই প্রভাবশালী এবং রাজা বললেই তারা নিম্নবর্গ হয়ে যাবেন না। তার অন্যতম কারণ রাজা নিজেই ক্ষত্রিয় বংশের প্রতিনিধি ছিলেন না। ফলে রাজা ষড়যন্ত্র করে শশ্বিদ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ কে পাঠালেন একটি সোনার বাছুর দিয়ে। যার ভিতরে ছিল লাল রক্তের মতো। শ্রীবিন্দ পাইন নামে স্বর্ণ বণিক, সোনার বাছুর ভাঙার সময় রক্ত বের হলে তখন শশ্বিদ্র নামে ব্রাহ্মণ চিৎকার করে লোকজন জোড় করেন এবং বলেন সুবর্ণ বণিক গরু হত্যা করেছে। এমনি করে আরও একজন স্বর্ণ বণিককে চুরির সোনা কেনার অপরাধে ফাঁসানো হয়েছিল। আনন্দ ভট্ট বল্লাল সেনের জীবনীতে লিখেছেন— রাজা প্রজাদের বললেন যে এবার থেকে কর্ম অনুসারে পদোন্নতি বা পদাবনতি করবেন। উচ্চবর্ণের কোন লোক যদি নিচ কাজ করে তবে তাকে পতিত ঘোষণা করা হবে। সুবর্ণ বণিকদের সোনা চুরি এবং গো হত্যার অপরাধের জন্য আজ থেকে তাদেরকে পতিত এবং শূদ্র বলে গণ্য করা হবে। কোন ভদ্রলোক সুবর্ণ বণিকদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। কোন পুরোহিতদের কাজ করাবেন না। কেউ এই জাতের সঙ্গে এক আসনে বসবে না বা আহার করবে না, যদি এই কাজগুলি করে তাহলে তিনিও পতিত হবেন। লালবিহারী দে প্রবন্ধে লিখেছেন—

> "The Inferior position which they now occupy in Hindu society is not owing to any inferiority of rank accorded to them at the first formation of that society, since they were included among the twice-born classes. It was not owing to any crimes which they had committed, since their very opposition to Ballal shows them to have been a courageous, an independent, and a high-spirited race. It was owing simply to the unjust decree of a capricious, bankrupt, and licentious king."[২২]

ফলে একথা বলাই যায় লালবিহারী দে বাংলার স্বর্ণ বণিকদের নিয়ে যে আলোচনাটি করেছেন সেখানে শুধু ঐতিহাসিক তথ্যই নেই, সম্ভাব্য সত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘৃণ্য জাতি ব্যবস্থা বা বর্ণ ব্যবস্থার এবং রাজনৈতিক শত্রুতা মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় অবনতি বা উন্নতির যে পরিচয় পাওয়া যায় যার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সুবর্ণ বণিকদের বাংলায় উত্থান থেকে তাদের সামাজিক পদমর্যাদার অবনতি পর্যন্ত পর্যালোচনা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক সংক্রমণের বীজ টিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

লালবিহারী দে 'Bengali Festivals and Holidays'[২৩] প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার পালা-পার্বণ আলোচনা করতে গিয়ে লালবিহারী দে বলেছেন, বাঙালির পালাপার্বণ আংশিকভাবে ধর্মীয় এবং আংশিকভাবে সামাজিক। বৈশাখ থেকে চৈত্র বারো মাসই বাঙালির উৎসব লেগেই থাকে। বাংলার নববর্ষ দিয়ে যার শুরু। ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই সময় যে আর্থিক লেনদেন হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন হিন্দু আইন প্রণেতা এবং ঋষিদের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, অনেক অযৌক্তিক অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠান গুলোর কথা বলতে গেলে, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের কিছু ধর্মীয় নির্দেশ যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের কিছু প্রতিষ্ঠান সাধারণ উপযোগিতা ও জনমঙ্গলের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈশাখ মাস খরা ও চরম উষ্ণতার এই ঋতুতে, হিন্দু আইনপ্রণেতারা বিচক্ষণতার সাথে বিধান দিয়েছেন যে, মানুষ, পশু এবং গাছপালা যেন ধর্মীয়ভাবে পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ পায় তার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাড়িতে পশুদের জন্য এবং পথিকদের জন্য জল ও কিছু খাবারেরও ব্যবস্থা যে করা হত সেকথা লালবিহারী দে উল্লেখ করেছেন। নিজে হিন্দু বাড়ির সন্তান ছিলেন ফলে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার গুলি যেমন তাঁর চোখে পড়েছিল তেমনি ভালো দিকগুলিকেও উল্লেখ করেছেন।

ঢেঁকি পুজো, দোল উৎসব, ধর্মরাজের পুজো, গঙ্গার মর্তে আগমন, জামাইষষ্ঠীর প্রসঙ্গ এনেছেন, দশহারার পুরোহিতকে দান করাকে লালবিহারী ব্যঙ্গ করেছেন। জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেন উড়িষ্যার পুরী আর বাংলার শ্রীরামপুরের একটি ছোটো গ্রামে এর জাঁকজমক দেখা যায়। উচ্ছৃঙ্খল লম্পট, আর বখাটে যুবকের দল ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তরুণবাবু সম্প্রদায়ের লোকজন উপপত্নী নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ঘাট থেকে নৌকা নিয়ে মহেশ নামের গ্রামে যাত্রা করে, অশ্লীল গান এবং নোংরা ভাষা তাদের সঙ্গী। শহরের বেশির ভাগ বারবণিতারা এই সমস্ত জায়গায় উপস্থিত থাকে বলে লেখক তীব্র ভাবে সমাজের ক্ষতিকর এই প্রভাব গুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঈশ্বরগুপ্তের 'স্নানযাত্রা' কবিতায় এই দৃশ্য গুলি আমরা দেখতে পাই। রথযাত্রা উৎসবে তীর্থের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। শ্রাবণ মাসের দোলনা উৎসব বা কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা এবং নাগদেবীর পুজোর প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণের প্রেমলীলার নাট্য অভিনয়কে তিনি ঘৃণার চোখে দেখেছেন। প্রাবন্ধিক লিখছেন—

> "The adoration over, the friends of the proprie-tor of the house where the festival takes place, are entertained with sweet-meats. The revelry of the night is concluded with a scenic representation of the loves of Krishna, in which ugly boys and grown-up men perform the parts of the charming Rádhá and the fair milk-maids of Brindaban. In this repre-sentation, the amours of the wanton lover of Mathura are detailed with disgusting circumstantiality; filthy songs are sung, with the melody of the screeching night-owl; and the actors exhibit a thousand indecent gestures and gesticulations of the body."[২৪]

প্রাবন্ধিক এইসব হিন্দু রীতিনীতির সাধারণ উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং নৈতিকতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সমস্ত পরিশীলিত বোধের ধ্বংসের মুখোমুখি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই অবক্ষয়কারী কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, খ্রিস্টীয় সত্যের ও শিক্ষার সম্মিলিত প্রভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের নৈতিক মানে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ঘটাতে পারে বলে মনে করেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের কথা তিনি বলেছেন। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজার কথা বলেছেন, এই উৎসবে হিন্দু বাঙালির আবেগ আগ্রহের সাথে, দেবী দুর্গা আচার অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে ব্যঙ্গতক দৃষ্টিভঙ্গতে। দুর্গাপূজার আবেগকে খ্রিস্টানদের বড়দিন উৎসবের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন প্রাবন্ধিক। এরপরে কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, ভাইফোটা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং কার্তিক পূজা নিয়ে পৌরাণিক কাহিনির কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কার্তিক পুজোর প্রসঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে চৎকার বর্ণনা আছে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসবের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেহেতু বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং ধান এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য, তাই ফসল কাটার সময়টি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সময়। কিন্তু বাঙালিরা একটি ধর্মপ্রাণ জাতিও; হিন্দুধর্ম তাদের রীতিনীতি ও প্রথার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই, সাধারণ ফসল কাটার আগে ধানের প্রথম আঁটি দেবতাদের উৎসর্গ করা হয়। এই উপলক্ষে বছরের নতুন চাল, দুধ এবং মৌসুমের ফল ও মূল যথাযথ গাম্ভীর্যের সাথে দেবতাদের নিবেদন করা হয়। মানবজাতির মহান পূর্বপুরুষ, সুপরিচিত মুনি ও ঋষি এবং উৎসব পালনকারী পরিবারের নিকট পূর্বপুরুষদেরও তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। এমনকি মাঠের পশু এবং আকাশের পাখিদেরও যত্ন নেওয়া হয়, কারণ তাদের সুবিধার জন্য নতুন ধান ক্ষেতে এবং উঁচু স্থানে রাখা হয়। বাঙালি, যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী, তিনি ঋতুর প্রথম ফসল দেবতা, পূর্বপুরুষ, শিয়াল এবং কাকদের উৎসর্গ করার পর সবশেষে নিজে তা গ্রহণ করেন। এই উৎসবটি, যাকে যথার্থই নতুন ধানের উৎসব বলা হয়, দেশের কোনো কোনো অংশে পুরুষালি খেলাধুলা, আতশবাজির প্রদর্শনী এবং ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদের জন্য ভোজের আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হয়। এই প্রথাটি ইহুদিদের প্রথম ফল উৎসর্গের উৎসবের মতোই।

রাস উৎসবের প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন— আনন্দ-উৎসব ও আমোদ-প্রমোদ; এবং রাধার প্রেমিকের উৎসবের ক্রীড়া ও উচ্ছল কৌতুকের আনন্দময় স্মৃতি, যা এই উৎসব ভক্তদের মনে জাগিয়ে তোলে, এই সবকিছুই রাস উৎসবকে নিম্নবঙ্গের বাসিন্দাদের কাছে একটি প্রিয় উৎসবে পরিণত করেছে। যে বাড়িতে এই উৎসব বেশ আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়, তার সামনে অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করা হয় এবং দোকান খোলা হয়, যেখানে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি, পান পাতা এবং সুপারি বিক্রি হয়। সব মিলিয়ে, এটি একটি প্রাণবন্ত ও আনন্দের দৃশ্য। কিন্তু পাঠককে একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, এই আনন্দগুলো নারী চরিত্রের উপর অত্যাচারের মতো কলুষতা থেকে মুক্ত নয়। তবে আমরা যদি বলি যে এই ধরনের ঘটনাগুলো উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহলে আমরা বাঙালিদের প্রতি অবিচার করব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, রাস উৎসব জাতীয় চরিত্রের নৈতিক অবক্ষয়ে ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পৌষ মাসে, দুটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি, যার কথা আমরা উল্লেখ করব, একটি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং এর সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের কোনো সম্পর্ক আছে বলে লালবিহারী দে মনে করেননি। পৌষ মাসে উদযাপিত হওয়ার কারণে এর নাম পৌষালী। মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে, হাতে ঝুড়ি এবং পিঠে বোঝা নিয়ে দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের প্রতিটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল ও সাধারণ সবজি ভিক্ষা করতে দেখা যায়। ভিক্ষা শেষ হলে, তারা গ্রামের উপকণ্ঠে একটি বাগানে যায়, যেখানে তারা একটি ভোজের আয়োজন করে। যেসমস্ত পরিবার সাধারণ খাদ্য ভাণ্ডারে অবদান রেখেছে, সেই সব পরিবারের পুরুষদের এই বনভোজনে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। জাতপাতের ভেদাভেদ থেকে উদ্ভূত সমস্ত আশঙ্কা দূর করার জন্য, তিন-চারজন ব্রাহ্মণকে রাঁধুনি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই বনভোজনগুলি, এর সাথে জড়িত নিষ্পাপ আনন্দের পাশাপাশি, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে। পৌষ মাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো পিঠা উৎসব।

মাঘ মাসে, একটি উৎসবই পালিত হয়, তা হলো সরস্বতী পূজা। পদ্মফুলের উপর দণ্ডায়মান এবং বীণা বাদনরত সুন্দরী ও বাগ্মী সরস্বতী হলেন হিন্দুদের জ্ঞানদেবী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। হিন্দুধর্মের নারী-অবমাননাকারী মনোভাবের সঙ্গেই এটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, নারীদের জ্ঞানদেবীর আরাধনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তাঁর দানে তাদের কোনো অংশ বা অধিকার নেই: কিন্তু এটি মোটেও কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে হিন্দুরা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে একজন নারী দেবীকে স্থাপন করেছে। মি. ওয়ার্ড তাঁর 'হিস্ট্রি, লিটারেচার অ্যান্ড রিলিজিয়ন অফ দ্য হিন্দুজ' গ্রন্থে, বলেছেন যে এই উৎসব উদযাপনের সাথে কিছু জঘন্য অশালীনতা জড়িত। প্রাবন্ধিক লালাবিহারী দে এই মতের সঙ্গে একমত হননি। মি. ওয়ার্ডের বইটিতে হিন্দুদের সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যের একটি বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে এবং প্রাবন্ধিক এর সূক্ষ্ম নির্ভুলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু লালবিহারী দে-র মতে— মি. ওয়ার্ড হিন্দুদের প্রতি কিছুটা বেশি কঠোর হয়েছেন: তিনি দেশীয় চরিত্রের উজ্জ্বল দিকের চেয়ে অন্ধকার দিকটিই বেশি তুলে ধরেছেন। ফাল্গুন মাসে, হিন্দুরা কৃষ্ণের দোল বা হোলি উৎসব পালন করে। হোলি উৎসবের সময় হিন্দুরা উচ্ছৃঙ্খলতায় লিপ্ত হয়, জুয়া খেলা, প্রকাশ্য রাস্তায় সবচেয়ে অশ্লীল গান গাওয়া হয়; পথচারীদের উদ্দেশ্যে জঘন্য গালিগালাজ করা হয়; নারীদের অপমান করা হয়; চৈত্র মাস, বাংলা বছরের শেষ মাস, মহান ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে, প্রাবন্ধিক দে এই উৎসবগুলোর সম্মানে সমস্ত সরকারি কাজকর্ম বন্ধ রাখাকে প্রত্যাহার করার কথা বলেছেন। সরকারি অফিসগুলো খোলা রাখা হোক এবং ঘোষণা করা হোক যে, যারা উপস্থিত থাকবেন তারা পূর্ণ বেতন পাবেন এবং যারা অনুপস্থিত থাকবেন তারা তাদের দিনের বেতন হারাবেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধের পরিমাণ কমতে পারে এবং জনগণের চরিত্রকে উন্নত করতে পারে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন।

লালবিহারী দে উনিশ শতকের অন্যতম ফসল। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবেশ ও ধর্মীয় পরিচয় তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে তিনি গ্রাম বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুভূতি এবং লেখার দক্ষতা তার সৃষ্টিকে অনন্য করে তুলেছে। প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেমন গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রত্যেকটি বিষয়কে নানান দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এবং তুলনামূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যটি তাঁর বেশিরভাগ লেখাইতেই আমরা পাই। সামাজিক অবস্থানে থাকা মানুষের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রায় যে প্রভাব সেটাকেই তিনি তাঁর বেশিরভাগ লেখাইতেই ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার মানুষের সামগ্রিক জীবনকে তিনি চিনতে এবং চেনাতে চেয়েছেন বারে বারে। তা ধর্ম বিষয়ই হোক, তা আচার অনুষ্ঠান বিষয়েই হোক, তা খেলাধুলা, উৎসব অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ সমস্ত বিষয়েই তাঁর যেমন দক্ষতা, তেমন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণ। তিনি কেবল আবেগ তাড়িত হয়ে কোন কিছু আলোচনাই করেননি, বরং সমালোচনার কোন ক্ষেত্র পেলে তা তিনি যথার্থভাবে করেছেন। ভালো খারাপের তথাকথিত বেড়াজালের বাইরে সামগ্রিক মানুষের মঙ্গলময়, শুভকর, সুখকর, শান্তি কামিপথকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এবং একথা বলাই যায়, যে তিনি সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেছেন। তার কারণ দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সেই সব লেখা নিয়ে আজও বাঙালি চর্চা করছে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও লালবিহারী আদ্যপ্রান্ত একজন বাঙালি ছিলেন এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর লেখায় সেই বাঙালিআনাই তাঁর লেখাকে অমর করে রাখবে। কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় প্রভাব থাকলেও বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-লোককথার ইতিহাসে উনিশ শতকে লালবিহারী দে-কে বাদ দিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব।

Reference:

১. মিত্র, রাধারমন, কলকাতা দর্পণ, দ্বিতীয় পর্ব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০৭
২. মল্লিক, জলধর, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩-৩৫
৩. মিত্র, রাধারমন, কলকাতা দর্পণ, দ্বিতীয় পর্ব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০৮
৪. জলধর, মল্লিক, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৬-৫৭
৫. মিত্র, রাধারমন, কলকাতা দর্পণ, দ্বিতীয় পর্ব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১৪
৬. মল্লিক, জলধর, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৮-৮৯
৭. তদেব, পৃ. ৯৩-৯৪
৮. Dey, Lalbihari, ‘Chaitanya and Vaisnavas of Bengal’, The Calcutta Review, VOL-XV, January-June, Calcutta, 1851, P. 172
৯. Ibdi, P. 190
১০. Ibdi, P. 191
১১. Ibdi, P. 193
১২. Ibdi, P. 198
১৩. Ibdi, P. 200
১৪. Dey, Rev. Lal Behari, ‘The Banker Caste Of Bengal’, The Bengal Magazine, VOL-1, Calcutta, 1873, P-281
১৫. Ibdi, P. 286
১৬. Ibdi, P. 286
১৭. Ibdi, P. 287
১৮. Ibdi, P. 288
১৯. Ibdi, P. 290
২০. Ibdi, P. 291
২১. Ibdi, P. 327
২২. Ibdi, P. 331
২৩. Dey, Lalbihari, ‘Bengali Festivals and Holidays’, The Calcutta Review, VOL-XVIII, Calcutta, 1852, P. 49
২৪. Ibdi, P. 54

Bibliography:

রাধারমন মিত্র, কলকাতা দর্পণ, দ্বিতীয় পর্ব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৩
দেবীপদ ভট্টাচার্য, রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
জলধর মল্লিক, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০১০
রেভা: লালবিহারী দে, গোবিন্দ সামন্ত, কলকাতা, ১৯৯৭
Rev. Lal Behari Dey, The Bengal Magazine, VOL-1, Calcutta, 1873

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 107
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 854 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Rev. Lal Behari Dey, The Bengal Magazine, VOL-IV, Calcutta, 1876
Rev. Lal Behari Dey, The Bengal Magazine, VOL-V, Calcutta, 1877
The Calcutta Review, VOL-XV, Calcutta, 1851
The Calcutta Review, VOL-XVIII, Calcutta, 1852